

শারহুল আক্বীদা আত-তহাবীয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৪৯. তাকদীর সম্পর্কে আসল কথা হলো, এটি সৃষ্টিকূলের ব্যাপারে আল্লাহর একটি গোপন বিষয়; যা নৈকট্যপ্রাপ্ত কোনো ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত কোনো নাবীও অবহিত নন।

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনে আবীল ইয় আল-হানাফী (রহিমাল্লাহু)

ক্ষতিকর ও অপছন্দনীয় জিনিস সৃষ্টি করার তাৎপর্য বা হেকমত - ৩

কেউ যদি বলে, বান্দা ভালো-মন্দ কিছুই করে না। যা কিছু হয় সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। তার জবাবে আমরা বলবো যে, এটি হলো জাবরীয়াদের মাযহাব। [10] জাবরীয়া মতবাদের লোকদের পক্ষে এ সংকীর্ণ স্থান থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব নয়। ঐ দিকে তাকদীরকে অস্বীকারকারী কাদারীয়া মতবাদের লোকদের পক্ষে জাবরীয়াদের তুলনায় তাদের মাযহাব থেকে বের হয়ে আসা অনেক সহজ। অর্থাৎ জাবরীয়াদের মাজহাব কাদারীয়াদের মাযহাবের চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট। কেননা কাদারীয়ারা খারাপ কাজ, পাপাচার ও গুনাহর কাজের সম্বন্ধ কেবল বান্দার দিকেই করে; আল্লাহর দিকে করে না। অপর পক্ষে জাবরীয়ারা সমস্ত পাপকাজের সম্বন্ধ আল্লাহর দিকেই করে এবং বলে এতে বান্দার কোন ইচ্ছা ও স্বাধীনতা নেই। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার বহু উর্ধ্ব। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কাদারীয়া ও জাবরীয়াদের মধ্যখানে। তারা উভয় শ্রেণীর বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তারা বলে আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর স্রষ্টা। এ হিসাবে আল্লাহর দিকে পাপাচারের সম্বন্ধ করা ঠিক আছে। বান্দা যেসব পাপাচার ও নাফরমানী করে থাকে তা আল্লাহ তা'আলার তাকদীর, ফায়ছালা এবং তার সৃষ্টি ও নির্ধারণগত ইচ্ছা অনুপাতেই হয়ে থাকে। কিন্তু ইহা তার শরীয়তগত ইচ্ছা, আদেশ ও নিষেধের বিরোধী। এ জন্যই তাদেরকে গুনাহ ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে শাস্তি দেয়া হবে। কেননা তারা তাদের ইচ্ছাতেই পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। এমনি তাদের ইচ্ছাতে আনুগত্যের কাজ করে বলেই তাদেরকে উত্তম বিনিময় দেয়া হয়।

যদি বলা হয় পাপাচার ও গুনাহর কাজ সৃষ্টি করার মধ্যে হেকমত রয়েছে এবং আল্লাহর ইচ্ছাতে বান্দারা তাতে লিপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে এর কারণে অনুতপ্ত হওয়া এবং তাওবা করার প্রয়োজন হয় কেন?

কোনো জিনিসকে তার আসল অবস্থায় না দেখে অন্যভাবে দেখার কারণে যার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, সে-ই কেবল এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারে। পৃথিবীতে যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা ও হেকমতের দাবি ব্যতীত কোনো কিছুই হয় না, তাই তিনি চাইলে পাপাচারও সংঘটিত হতো না। সুতরাং গুনাহর কারণে তাওবার দরকার নেই। কারণ তা আল্লাহর নির্ধারণ অনুযায়ী হয়েছে। তাতে আল্লাহ তা'আলার হেকমত রয়েছে। এ কারণেই সুফীরা পাপাচারকেও আনুগত্যের কাজ হিসাবে দেখে। কেননা তা আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্ধারণ অনুপাতেই হয়ে থাকে। তাদের কেউ কেউ বলেছে, আমি যদি আল্লাহর আদেশের বিরোধীতা করে থাকি, তা তার ইচ্ছার অনুরূপ করেছি। তাদের কোনো এক কবি বলেছেন,

أصبحت منفعلاً لما تختاره مني ففعلني كله طاعات

আমার জন্য তুমি যা কিছু নির্ধারণ করো আমি তাই করি। সুতরাং আমার সমস্ত কাজই তোমার আনুগত্য স্বরূপ।
যারা এ রকম বলে, তারা সৃষ্টিকূলের মধ্যে সর্বাধিক মুর্থ এবং আল্লাহ সম্পর্কে সর্বাধিক অজ্ঞ। সেই সঙ্গে তারা

আল্লাহর সৃষ্টি ও তার দ্বীন সম্পর্কিত হুকুম-আহকাম সম্পর্কেও অজ্ঞ। শরীয়াতের আদেশ ও হুকুম অনুযায়ী কাজ করার মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর আনুগত্য। আল্লাহর ইচ্ছা ও তাকদীর অনুযায়ী পাপাচারে লিপ্ত হলে আনুগত্য হয় না। তাকদীর অনুযায়ী কাজ হলেই যদি সংকাজ হয়ে যেতো, তাহলে ইবলীসও আল্লাহর সর্বাধিক আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতো। সেই সঙ্গে নূহ, হুদ, সালেহ, লুত, শুআইব ও ফেরআউনের সম্প্রদায়ের লোকেরাও পূর্ণ ঈমানদার হতো। কেননা তারাও আল্লাহর নির্ধারণ অনুপাতেই পাপাচার ও অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছে। যারা তাদেরকে ঈমানদার মনে করে তারা একদম মূর্খ। তবে কেউ যখন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম দেখে, নিজের মধ্যে তাকদীরের বিধান বাস্তবায়ন হতে দেখে, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর প্রতি মুহতাজ মনে করে এবং চোখের পলকের জন্যও আল্লাহর হেফাযত থেকে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে না, তখন সে আল্লাহর ইচ্ছাতেই সবকিছু করে। এ অবস্থায় সে নিজের ইচ্ছায় কিছুই করে না। বান্দা যখন এ অবস্থায় পৌঁছে যায়, তখন তার থেকে পাপাচারের কল্পনাও হতে পারে না। কেননা তখন সে সুরক্ষিত দূর্গের মাধ্যমে পরিবেষ্টিত থাকে। তখন সে আল্লাহর ইচ্ছাতেই শুনে, আল্লাহর ইচ্ছাতেই দেখে এবং আল্লাহর ইচ্ছাতেই ধরে এবং আল্লাহর ইচ্ছাতেই চলে। এ অবস্থায় বান্দার পক্ষ হতে পাপাচার সংঘটিত হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। বান্দা যখন এ অবস্থার বাইরে চলে যায় এবং একাকী হয়ে যায় তখন তার উপর নফসের হুকুম চেপে বসে। এ সময়ই সে গাফিলতির জালে আটকা পড়ে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে শুরু করে।

অতঃপর প্রবৃত্তির এ ঘন কুয়াশা যখন তার উপর থেকে উঠে যায়, তখনই সে অনুতপ্ত হয়, তাওবা করে এবং আল্লাহ তা‘আলার দিকে ফিরে আসে। কেননা পাপাচারে ডুবে থাকার কারণে সে তার রব থেকে দূরে সরে গিয়ে স্বীয় নফসের চাহিদা পূরণের কাজে মগ্ন ছিল। সুতরাং সে যখন পূর্বের অবস্থা থেকে ফিরে এসেছে, তাই তার বর্তমান সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। ফলে সে তার রবের সাথে যুক্ত হয়েছে।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কুফুরী যদি আল্লাহ তা‘আলার নির্ধারণ অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং আমাদেরকে যেহেতু আল্লাহ তা‘আলার নির্ধারণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার আদেশ করা হয়েছে, তাই কিভাবে আমরা তাকদীর অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়ের প্রতিবাদ করতে পারি?

এর জবাবে প্রথমত: বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা‘আলা যা নির্ধারণ করেছেন এবং যেসব বিষয়ের ফায়ছালা করেছেন, তার সবগুলোর প্রতি আমাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে বলা হয়নি। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতে এ ধরনের কোনো আদেশ খুঁজে পাওয়াও যাবে না। বরং আল্লাহ তা‘আলার ফায়ছালার মধ্যে এমন বিষয় রয়েছে, যাতে সন্তুষ্ট হওয়ার মত এবং তাতে এমন কিছু রয়েছে, যা অপছন্দনীয়। কেননা বিচারক যখন রায় প্রদান করে তখন তিনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন না। বরং কিছু কিছু রায়কে তিনি অপছন্দ করেন। যাদের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা হয়ে থাকে, তাদের উপরও মানুষ ক্রোধান্বিত হয়, তাদেরকে ঘৃণা করা হয়, তিরস্কার করা হয় এবং তাদের উপর লা’নত করা হয়।

দ্বিতীয়ত: বলা যেতে পারে যে, এখানে দু’টি বিষয় রয়েছে।

- (১) আল্লাহ তা‘আলা যা নির্ধারণ করেন। আর এটি এমন কাজ, যা আল্লাহ তা‘আলার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত
- (২) আল্লাহ তা‘আলার নির্ধারণকৃত বিষয়। আর এটি হলো আল্লাহ তা‘আলার সত্তা থেকে আলাদা একটি বিষয়। আল্লাহ তা‘আলা যা নির্ধারণ ও ফায়ছালা করেন, তার সবগুলোর মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ, ইনমাফ এবং বিরাট হেকমত। এর সবগুলোর প্রতিই আমরা সন্তুষ্ট।

ঐ দিকে নির্ধারণকৃত বিষয়গুলো দু'প্রকার।

(১) যার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট থাকি।

(২) আর তা থেকে এমন কিছু বিষয়ও রয়েছে, যাতে আমরা সন্তুষ্ট হই না।

তৃতীয় জবাব হলো, আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণের দু'টি সম্পর্ক ও সম্বন্ধ রয়েছে। একটি সম্পর্ক হলো আল্লাহ তা'আলার দিকে। এ দিক থেকে তার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া জরুরী। অন্য সম্পর্কটি হচ্ছে বান্দার দিকে। এ সম্পর্কের দিক থেকে তাকদীরের নির্ধারণ দুই প্রকার। একটির প্রতি মানুষ সন্তুষ্ট হয় এবং অন্যটির প্রতি মানুষ সন্তুষ্ট হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ আত্মহত্যার বিষয়টি পেশ করা যেতে পারে। আত্মহত্যার বিষয়টিকে দুইভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টি নির্ধারণ করেছেন, লিখেছেন, এটি সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন এবং নিহত ব্যক্তির বয়স ও হায়াত এ পর্যন্তই নির্ধারণ করেছেন। আত্মহত্যার সময় পর্যন্তই তার শেষ বয়স নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার এ ফায়ছালা ও নির্ধারণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা জরুরী। আর যার পক্ষ হতে আত্মহত্যা নামক অপরাধটি সংঘটিত হয়, যে নিজেকে হত্যা করে, এটি উপার্জন করে, স্বীয় ইচ্ছায় এদিকে অগ্রসর হয় এবং স্বীয় কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে। এ দিক বিবেচনায় আমরা তাকে ও তার কাজকে ঘৃণা করি এবং তার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট থাকি না।

ইমাম ত্বাহবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, *والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسُلم الحرمان ودرجة الطغيان* “এ সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা অথবা অনুরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ব্যর্থ হওয়ার কারণ, বঞ্চনার সিঁড়ি এবং সীমালংঘনের ধাপ”।

কোনো কিছুর অনুসন্ধান করতে গিয়ে উহার গভীরতায় প্রবেশ করাকে *مبالغة* বলা হয়। তাকদীরের বিষয়ে বেশী অনুসন্ধান চালানো এবং উহার ব্যাপারে বেশী বেশী কথা বলা অপদস্ত হওয়ার কারণ। *الذريعة* শব্দের অর্থ হলো মাধ্যম ও কারণ। *الدرجة*, *الذريعة* এবং *السلم* পরস্পর সামর্থ বোধক। এমনি *الحرمان*, *الخذلان* এবং *الطغيان* পরস্পর সামর্থ বোধক শব্দ। তবে *الخذلان* (বিফল হওয়া) শব্দটি *الظفر* (সফল হওয়া) শব্দের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর *الطغيان* শব্দটি *الاستقامة* শব্দের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইমাম ত্বাহবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, *فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة* অতএব সাবধান! তাকদীর সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা এবং কুমন্ত্রণা হতে পূর্ণ সতর্ক থাকুন।

আবু হুরায়রা রাডিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছাহাবীদের একদল লোক এসে জিজ্ঞাসা করলো,

إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَنْعَازُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ

“আমরা আমাদের অন্তরে কখনো কখনো এমন বিষয় অনুভব করি, যা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা আমাদের কাছে খুব কঠিন মনে হয়। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সত্যিই কি তোমরা এরকম পেয়ে থাক? তারা বললেন হ্যাঁ, আমরা এরকম অনুভব করে থাকি। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটি তোমাদের ঈমানের স্পষ্ট প্রমাণ” [11]

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: এটি তোমাদের ঈমানের স্পষ্ট প্রমাণের লক্ষণ। এর মাধ্যমে তিনি ইঙ্গিত করেছেন, তারা এ ব্যাপারে কথা বলাকে খুব বড় অপরাধ মনে করতেন। ইমাম মুসলিম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হতে আরো বর্ণনা করেন যে, নাবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একদা ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। জবাবে তিনি বললেন, "تلك محض الإيمان" এটি শুধু ঈমানেরই আলামত। [12]

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদীছেও একই কথা বলা হয়েছে। মানুষের মনের ওয়াসওয়াসা ও মানুষ তার মনের সাথে কথা বলা দুই জন মানুষের পরস্পরিক কথা-বার্তার মতই। সুতরাং শয়তানী ওয়াসওয়াসা দূর করার চেষ্টা করা এবং তার কুমন্ত্রণাকে বড় মনে করা সুস্পষ্ট ও খাঁটি ঈমানের লক্ষণ। এ ব্যাপারে এটিই ছিল ছাহাবী এবং উত্তমভাবে তাদের অনুসারী তাবেঈদের তরীকা। তাদের যুগের পরে এমন এক শ্রেণীর লোক আগমন করলো, যারা অনুমানের উপর ভিত্তি করে তাকদীর সম্পর্কে ওয়াসওয়াসা সংক্রান্ত বিষয়াদি লিখে অনেক কাগজ-কালি নষ্ট করেছে। এগুলো নিছক সন্দেহ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এরা এগুলো লিখে বিশাল পরিমাণ কাগজ কালো করার সাথে সাথে মানুষের অন্তরগুলো কালো করে ফেলেছে। সত্যকে ধ্বংস করার জন্য তারা অন্যায় বিতর্ক করেছে। এ জন্যই শাইখ ইলমুল কলাম, তাকদীর ও তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়ে বেশী গবেষণা করার নিন্দা করেছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ»

“আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি সর্বাধিক ঘৃণিত, যে সর্বাধিক ঝগড়াটে”। [13]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাল্লাহু আমাদের কাছে আবু মুআবিয়া হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আমর বিন শুআইব থেকে দাউদ বিন ইবনে আবী হিন্দ, আমর বিন শুআইব বর্ণনা করেন তার পিতা থেকে, তার পিতা বর্ণনা করেন তার দাদা থেকে। তিনি বলেন, একদিন রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হলেন। লোকেরা তখন তাকদীর সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, তাকদীর সম্পর্কে তর্ক করতে দেখে রাগে তার চেহারা এমন হলো যে মনে হচ্ছিল তাতে ডালিমের দানা ফুড়ে দেয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমাদের কী হলো? তোমরা আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে দাড়া করাচ্ছে কেন? তোমাদের পূর্বের লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমি সেই মজলিসে উপস্থিত না হয়ে যতটা খুশী হয়েছি, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য কোনো মজলিসে উপস্থিত না হতে পেরে ততটা খুশী হতে পারিনি। [14]

ইমাম ইবনে মাজাহ এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا

“তোমরাও একইভাবে নিজেদের অংশের স্বাদ উপভোগ করেছো। যেমন তারা করেছিল এবং তারা যেমন অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত ছিল তেমনি বিতর্কে তোমরাও লিপ্ত রয়েছে”। (সূরা আত তাওবা: ৬৯) এ আয়াতে الخلاق শব্দটি النصيب তথা অংশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা সূরা বাকারার ২০০ নং আয়াতে বলেন,

وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ

“এ ধরনের লোকের জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নেই”। (সূরা আল বাকার: ২০০)

অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা যেভাবে তাদের দুনিয়ার অংশ উপভোগ করেছিল, তোমরাও সেভাবে তোমাদের দুনিয়ার অংশ উপভোগ করেছে। তারা যেভাবে অন্যায় বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, তোমরাও সেভাবে অন্যায় বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। তোমরা ঐ দল বা শ্রেণী কিংবা প্রজন্মের ন্যায় অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এখানে দুনিয়ার অংশ উপভোগ করা এবং অনর্থক বিতর্কে একসাথে উল্লেখ করেছেন। কারণ এ দুটি কারণেই মানুষের দ্বীন ধ্বংস হয়। অন্যায়-অপকর্ম এবং খারাপ আকীদার কারণেই মানুষের দ্বীন ও দুনিয়া ধ্বংস হয়। নফসের প্রবৃত্তির অনুসরণ করার কারণেই প্রথমটি সংঘটিত হয়। আর দ্বিতীয়টি সংঘটিত হয় দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার কারণে।

ইমাম বুখারী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«تَأْخُذُ أُمَّتِي مَأْخِذَ الْفُرُوقِ قَبْلَهَا شَيْبًا بِشَيْبٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ» قَالُوا: فَارِسَ وَالرُّومَ؟ قَالَ: فَمَنْ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ»

“আমার উম্মত পূর্ববর্তীদের চালচলন হুবহু অনুসরণ করবে। যেমন এক বিঘত অন্য এক বিঘতের এবং এক বাহু অন্য বাহুর সমান হয়। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, পূর্ববর্তী উম্মত বলতে পারসিক ও রোমানদের বুঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, তাদেরকে ছাড়া আর কারা উদ্দেশ্য হতে পারে?”[15]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক পায়ের জুতা যেমন অন্য পায়ের অনুরূপ হয়, ঠিক তেমনি আমার উম্মতের উপর ঐরূপ অবস্থা আগমন করবে। এমনকি তাদের কেউ তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকলে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোক পাওয়া যাবে। আর বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে বিভক্ত হয়েছিল ৭২ দলে। আর এ উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। এর দ্বারা তিনি বিদআতী দল উদ্দেশ্য করেছেন। মাত্র একটি দল ব্যতীত বাকী সব দলই জাহান্নামে যাবে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! সেটি কোন্ জামা'আত? তিনি তখন বললেন,

«مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»

“আমি যে হকের উপর আছি এবং আমার ছাহাবীগণ যে হকের উপর রয়েছে, যারা সে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তারাই হবে সেই নাজাত প্রাপ্ত জামা'আত।[16] ইমাম তিরমিযী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«تَفَرَّقَتِ [الْيَهُودُ] عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً»، وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَفَتَّرَقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

ইহুদীরা বিভক্ত হয়েছিল ৭১ অথবা ৭২ দলে। খ্রিষ্টানরাও বিভক্ত হয়েছিল ৭১ অথবা ৭২ দলে। আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। ইমাম আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করার পর বলেন, হাসান- ছহীহ।

মুআবীয়া বিন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইহুদী-খ্রিষ্টানরা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে বিভক্ত হয়েছিল ৭২ দলে। আর এ উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ দলে।[17]

এখানে প্রবৃত্তির অনুসারী ও বিদ'আতী দল উদ্দেশ্য। একটি দল ব্যতীত বাকীসব দল জাহান্নামে যাবে। আর এরা হলো জামা'আত।

এ উম্মতের মধ্যে যে মাস'আলাটি নিয়ে সবচেয়ে বড় মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, তা হলো তাকদীরের মাস'আলা। এতে রয়েছে অনেক দীর্ঘ আলোচনা।

ফুটনোট

[10]. এ মতাদর্শের মাধ্যমে তারা বান্দাকে মরা কাঠ ও পাথরে পরিণত করেছে। তাদের মতে বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা যেভাবে ঘুরান বান্দা সেভাবেই ঘুরে। তার নিজস্ব কোন স্বাধীনতা ও এখতিয়ার নেই। তাই ভাল-মন্দ সবই একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতাতেই হয়। এ যেন শিশুর হাতে লাটিম এবং কাঠ-পল্লাষ্টিকের পুতুলের মতই। তারা আরো বলে, মানুষের পানাহার করা, ঘুমানো, আল্লাহর আনুগত্য করা এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়া বাতাস তুলা উড়িয়ে নেয়া এবং বন্যার পানি খড়কুটা ভাসিয়ে নেয়ার মতই। এগুলোতে বান্দার কোনো ইচ্ছা ও স্বাধীনতা নেই। শিশুর হাতে লাটিম শিশুর সম্পূর্ণ অনুগত ও বাধ্যগত, পুতুলকে শিশু যেভাবে নাচায় পুতুল সেভাবেই নাচে। বান্দাও আল্লাহর হাতে ঠিক সেরকমই। (নাউযুবিল্লাহ)

সম্ভবত এই জাবরীয়াদের মতবাদ থেকেই ভোগবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, ওয়াহদাতুল উজুদ (সর্বেশ্বরবাদ) এবং বস্তাপঁচা সুফীবাদের সূচনা হয়েছে। কেননা সুফীবাদের মধ্যে যারা ওয়াহদাতুল উজুদে বিশ্বাসী তারা কোন কিছুকেই হারাম মনে করেনা। মদ, জিনা-ব্যভিচারসহ সকল প্রকার কবীরা গুনাহতে লিপ্ত হওয়াই তাদের জন্য বৈধ। তারা মনে করে সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। বান্দার এখানে কোন ইচ্ছা ও স্বাধীনতা নেই।

তাদের এ কথা মানুষের সুস্থ বিবেক ও বোধশক্তির সুস্পষ্ট বিরোধী। তাদের কথা মানা হলে নাবী-রসূল পাঠানো অযথা ও নিরর্থক হয়ে যায়। তাদের কথা যদি সঠিকই হতো, তাহলে অতীতে যারা নাবী-রসূলদের দাওয়াত অস্বীকার করলো, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দিলেন কেন? কিয়ামতের দিন তাদেরকে জাহান্নামে দিবেন কেন? বান্দার কাজ অন্যের দ্বারা হলে তার কাজের জন্য মানুষ তাকেই দোষে কেন? তার ভাল কাজের প্রশংসা করে কেন? বান্দার কাজ যদি আল্লাহর দ্বারাই হয়ে থাকে, তাহলে কি বান্দাকে শাস্তি দেয়া কিংবা ছাওয়াব দেয়া অন্যায ও নিরর্থক হয় না? অথচ আল্লাহ তা'আলা যুলুম ও নিরর্থক কাজ করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

মোটকথা জাবরীয়ারা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও সবকিছুর উপর তার সার্বভৌমত্ব সাব্যস্ত করতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার আদল-ইনসারফ ও ন্যায বিচারের কথা বলতে গেলে ভুলেই গিয়েছে। তাদের কথা থেকে আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতার বিশেষণ সাব্যস্ত হলেও আল্লাহ তা'আলার আরেকটি সিফাত অচল হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার আদল তথা ন্যায বিচারের দাবী হচ্ছে, তিনি বান্দাদের উপর মোটেই যুলুম করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

“আল্লাহ কারো উপর এক অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। যদি কেউ একটি সৎকাজ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন”। (সূরা নিসা: ৪০) আল্লাহ তাআলা সূরা আনফালের ৫১ নং আয়াতে আরো বলেন,

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

“এ হচ্ছে সেই অপকর্মের প্রতিফল যা তোমরা আগেই প্রেরণ করেছো। আল্লাহ তার বান্দাদের উপর যুলুমকারী নন। এ রকম আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা যুলুম করা থেকে পবিত্র। সুতরাং বান্দাকে তার আদেশ বাস্তবায়ন করার স্বাধীনতা না দিয়ে এবং নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা ও ক্ষমতাবলে পাপ কাজে বাধ্য করে শাস্তি দিলে ন্যায় বিচারের ব্যাঘাত ঘটে। তাই তিনি তার আদল বা ন্যায় বিচার ঠিক রাখার জন্য বান্দাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। যাতে করে স্বেচ্ছায় আনুগত্যের কাজ করে সে নিজেই পুরস্কার পায় আবার আনুগত্যের খেলাফ করলে সে নিজেই শাস্তি ভোগ করে। যাতে করে আল্লাহ তাআলার উপর যুলুম করার কোন অভিযোগ না আসে। (আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত রয়েছেন)

আল্লাহ তাআলার সবগুলো সিফাতকেই একসাথে সাব্যস্ত করতে হবে। একটি মানতে গিয়ে আরেকটি ছেড়ে দিলে চলবেনা। তাই আল্লাহর আদলের দাবী হলো তিনি কাজ করার বা না করার স্বাধীনতা ও এখতিয়ার না দিয়ে কাউকে শাস্তি দিবেন না। জাবরীয়াদের কথা মানতে গেলে আল্লাহর আদল সিফাতটি ছুটে যায়।

সুতরাং বান্দার কাজ প্রকৃতপক্ষে বান্দা তার নিজস্ব ইচ্ছাতেই করে। যদিও তা আল্লাহর সৃষ্টি। আমরা সবাই জানি যে, বান্দার হাতে অস্ত্র থাকলে বান্দাই সেটি চালায়। সে অস্ত্র দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে না কি ডাকাতি করবে অথবা নিরপরাধ মানুষকে খুন করবে এ ব্যাপারে সে স্বাধীন। তার হাতে পয়সা থাকলে সে পয়সা দিয়ে মদ ক্রয় করবে? না কুরআনের তাফসীর ক্রয় করবে? এটি তার ইচ্ছাধীন।

আপনি যদি আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন: কোথায় যাচ্ছে? বন্ধু হয়ত জবাব দিবে জামাআতের সাথে নামায আদায়ের ইচ্ছায় ঘর থেকে বের হয়েছি কিংবা বলবে বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা করছি.....। সুতরাং জানা গেল যে, বান্দার ইচ্ছাতেই বান্দা কাজ করে। আল্লাহ তাআলা বান্দার মধ্যে সেই ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাকে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তার অপব্যবহার করলে এবং আল্লাহর মর্জির খেলাফ চললে সে নিন্দিত হয়। আর তার ইচ্ছার সঠিক ব্যবহার করলে এবং উহাকে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক চালালে আল্লাহ তাআলা তাকে সৎপথে চলতে সাহায্য করেন। (আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত)

[11]. মুসলিম ১৩২, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ: অন্তরের ওয়াস্ ওয়াসা।

[12]. ছহীহ মুসলিম ১৩৩।

[13]. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭১৮৮, ছহীহ মুসলিম ২৬৬৮।

[14]. হাদীছটি ছহীহ। ইমাম আহমাদ এবং অন্যান্য ইমামগণ ইহা বর্ণনা করেছেন।

[15]. ছহীহ বুখারী ৭৩১৯।

[16]. হাসান: তিরমযী ২৬৪১, মুস্তাদরাক হাকীম ৪৪৪।।

[17]. ছহীহ, দেখুন, শারহুল আকীদাহ আত তাহবীয়া, টিকা নং- ২৬৫।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8958>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন